সমাজ

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

দশ আনা]

বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

প্রকাশক
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
—কলিকাতা—

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস;
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

সমাজ



হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা

"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি! যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরল প্রাণ বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে,
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!"

করতল-চট্‌চটাধ্বনি-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু," "আমরা আর্য্য", "আমরা শ্রেষ্ঠ" এবম্প্রকার জাতীয়ক গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্য্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন মস্তককণ্ডূয়নসূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।

কোন বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। "নেতি" "নেতি" ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ্‌সংজ্ঞক পরিচয়। আবার বস্তুটি এইরূপ, ওইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপ পরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা অগ্রেই বলা যাউক। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্ম্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্য্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব শিব-মন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধ্বাচার্য্য আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া

দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চমকার-সাধক ছাগমহিষহননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেক দিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুক্কুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহামাংস ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধিসাধ্যের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা

কোথায় ? কোন্ আলম্বে হিন্দুর জাতিয়তা আলম্বিত আছে ?

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আর্য্যবুদ্ধি বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা যথাসময়ে পর্য্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বলে, মানুষ নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরিবর্ত্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক দর্শনচিন্তাবিধি একই। এই নির্দ্ধারণ একান্ত শিরোধার্য্য। তথাপি হিন্দুচিন্তাপ্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিধিগত পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটী পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া উর্দ্ধে অনন্তের দিকে উঠিল, মেঘাকাশ ছাড়াইয়া গ্রহতারকামণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া ছায়া পথে পঁহুছিল। এই দিগ্বিহীন শূন্যে আনন্দের

গভীরতায় ডুবিয়া বলিল, অনন্তপরমব্যোমে ভূমানন্দ, অসঙ্গানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ্‌দিগন্তর পরিক্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য্য, কত সম্বন্ধ, কত কার্য্যকারণঘটিত সুষমা দেখিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল—অনন্তের অখণ্ডত্ব সমন্বয়ে, সংশ্লেষে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আর্য্য ঋষি, দ্বিতীয়টি যুনানী বা গ্রীক দ্রষ্টা।

দুইটি মৎস্য জলধির স্বরূপ নির্ণয়োদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিল। একটি ডুবিল, গভীরতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তূষ্ণীম্ভূত। অপরটি পারদৃশ্বজ্ঞানলাভবাসনায় ক্রম-বন্ধন করিল। প্রখরস্রোতপ্রতিরোধী বলের সহিত উত্তাল তরঙ্গাঘাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য জর্ম্মণ।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া একতা দর্শন করা য়ুরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা

বা অন্তর্দ্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, সূর্য্যের স্বর্ণকবাট উদ্ঘাটন করিয়া সূর্য্যের সারভূত নিস্কলঙ্ক বিরজ হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর য়ুরোপীয়েরা সূর্য্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুত্বনিহিত সুষমা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর প্রভবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে;—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাশৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং—

কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠ-চিন্তার গতি নির্দ্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কালীকরালী-মনোজবা প্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন আহুতি ভোজন করিত তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অগ্নিদেবকে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রমশালী প্রভঞ্জন ধরিত্রীকে আলোড়িত করিত তখন পবনদেবকে "শংনো বায়ু" বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন—এবম্প্রকারে স্তুতি করিতেন। গভীর নির্ঘোষী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচি-বিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়-শক্তি ও চৈতন্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আর্য্য ঋষিদের আধ্যাত্মিকদর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক পরিচয় পাওয় যায়। তাঁহারা কার্য্যকারণ পরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ারয়া আদিকারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ-কর্ত্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণজলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে তপনতপ্ত জলকণার

সমবায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যাহা ছিল না তাহা কিরূপে হইল। মেঘ ছিলনা মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ব্ববর্ত্তী জড় প্রক্রিয়া ছিলনা হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাদ্ভাগে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসতের হাত হইতে এড়াইতে পারিবনা। যদি কোটি যোজন ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে-ই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসত অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী অব্যবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপসমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ, সারতত্ত্ব বাস করে। ঋষিরা ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একেবারেই অদৃশ্য হিরণ্যগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে। আর্য্য-একনিষ্ঠতার আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অগ্নির দেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত হইল? বায়ু বরুণ তপনাদিদেবতা কর্ত্তা হইয়াও কার্য্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্য্যেরও যে নাম কর্ত্তার ও সেই নাম। এই সমনামতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন আর্য্য ঋষিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে ঋষি (দৃশি) বলা হইত। কর্ত্তা কোন অপূর্ব্ব মায়াশক্তি বলে কার্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্য্যকারণে ব্যবহারতঃ ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ তাহারা অভিন্ন—এই অভেদতত্ত্ব সমগ্র বেদ গাথায় গীত হইয়াছে। কর্ত্তা এবং কার্য্যের অভেদভাব বিম্বরূপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাতি অদ্বিতীয়ের মায়িক বহুত্ব, বৈদিক ঋষিদিগের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূততত্ত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব

দ্বৈতান্ধকারাবৃত। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সদ্‌রূপী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমগ্র ভূতপ্রপঞ্চকে সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুজাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুস্থানে সাংখ্যদর্শনের সম্মান আছে বটে কিন্তু সাংখ্যমতের পোষক একেবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের একত্ব গভীরতর। ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা প্রভেদে বহু; সমুদ্র এক, কিন্তু লহরী-লীলা বহুত্বময়; মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবদৃষ্টে বহু; সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকেনা। ব্রহ্মের সত্ত্বায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সম্বন্ধের প্রয়োজন

থাকে; যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমাথিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সদ্বস্তুর পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণে যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্ম-পরিণাম যতদূর হইবার সম্ভাবনা ততদূরই হওয়া ন্যায্য। ক্রমান্বয়ের স্থান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিজে কারণ হন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্ব পরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতে একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু ঋষি-প্রণোদিত হিন্দুর একমুখীন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে শতকরা দশজনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দুষ্প্রাপ্য।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর একনিষ্ঠতার চরম-তৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু একভিন্ন পরমার্থতঃ দুই হইতে

পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী, আপ্তকাম; সম্বন্ধনিরপেক্ষ, আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন কিন্তু সেই কারণবীজ তাঁহার সত্বাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব বা কারণত্ব একটা বাহুল্য বা ঐশ্বর্য্য মাত্র, তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্রষ্টৃত্বকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্বার উপচয় বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যতদিন ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয়, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অলীক, সদ্রূপে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্ত্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে ত অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মসত্বা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গন্ধর্বনগরের ন্যায় এক অঘটঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মতে অবস্থিত কিন্তু

স্বরূপতঃ নহে, বাহুল্যভাবে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একই বহু হইয়াছে, কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ। একের পরিবর্ত্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাতি হয়। ঋষিরা যে অগ্নিদেবতাকে অগ্নি বলিতেন, কার্য্যের নামে কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই একত্বের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্বদর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে ইহার পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা! পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্য সন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে হইবে, কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

একনিষ্ঠায় অভ্যুদয়চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয় বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষ সকল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানপ্রভাবে পরম শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তা সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলণ্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহ পরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অ-প্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্দ্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

তিন শত্রু

কথায় বলে, "তিন শত্রু দিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়-জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শ-বশতঃ গড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশ-কালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষ-হেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কারা ?

প্রথম।—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্ষে ও অনার্ষে, ভগবদ্গীতায় ও মনসা-ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাহা বেদ। বেদগাথা যদিও ইঁহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ী

চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল,—"কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।" ভোলানাথ মহেশ ধুতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, আর 'কপালে আগুন' ত শিবের বিশেষ বৈভব। গোঁড়া মহোদয়েরা তেমনি স্বদেশগৌরবের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে ধন্য মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' 'হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শনবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল' য়ুরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল, তণ্ডুলও ভাল, তুষও ভাল। আহা! গোঁড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ।

"সকণ্টক কইমাছ করয়ে ভক্ষণ।
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥"

এখন ইহাদের গলায় কাঁটা বিঁধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের গোঁড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়। ইংরাজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষী-

ভক্ষীর দল। ইঁহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গ গুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টককাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি তথাস্তু বলিয়া হ্যাট্‌কোট্‌রূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচাঁমচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতাঙ্গদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিছায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্ম্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে য়ুরোপীয় হওয়াই উচিত। য়ুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিছায় তাহারা জগদ্‌গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উদাসীন। ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত সমাহিত, স্থির, ধীর, অলসগতি! আর য়ুরোপীয়েরা

কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—এক মাসের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রলঙ্ঘন করে, অভেদ্য গিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা। ভীরুতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীচ্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজিনবীশ সংস্কারকেরা তার-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বচন!" "সত্য বচন!!" আমরা ধর্ম্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ে কোন মতামত রাখি না—কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আমরা য়ুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজি শিক্ষিত সভ্য-দলটি যথেচ্ছাচারী—না স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?

তৃতীয়!—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'-গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীন সত্য লাভ করা যায় হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হারবার্ট স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূত ও সৎ ও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি,

সদাই স্তিমিতলোচন, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাপ করে ; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত ; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমান মাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায় ; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোটবড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোন এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্, অপর পক্ষেরও অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্। পুরাতন সভ্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত,নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে, এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পূরা-সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হইতেছে। মুসলমান মাঝী আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরেজী-সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু "দুর্গা আল্লা" "দুর্গা আল্লা" বলিতে আরম্ভ করিল। এই সমন্বয়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের

উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার-ববম্‌বম্‌-হালেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন,—যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটী সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিষ্ঠা-বিহীন, সর্ব্বনাশী সংস্কারক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তিন প্রকার উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রসৃত হইয়াছিল। যুনানী বা গ্রীক সদৃশপ্রিয়তা, রোমক বিসদৃশযোগশীলতা ও হিন্দু সমন্বয়প্রতিষ্ঠা।

গ্রীকেরা সকল মতের ও ভাবের অসমান, বিসদৃশ অংশ ত্যাগ করিয়া সমান, সদৃশ অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক গুণসকল ভিন্নজাতির সদৃশগুণের সহিত মিশিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল! গ্রীকদর্শনকারগণ জগতে বিকশিত দেবত্বের ও মনুষ্যত্বের সাধারণভূমি অধিকার করিতে যত্ন করিতেন।

রোমীয়েরা বিসদৃশ পদার্থের একীকরণে পটু ছিল। কোন দেশে রোমের জয়পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র বন্দীদের সহিত তদ্দেশস্থিত দেবতারাও রোমে চালান হইত। রোমবাসীদের বিদেশীয় দেবদেবীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সম্মেলন করা বড় ভাল লাগিত। মিলুক আর না মিলুক, সংখ্যা ও

আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইলেই তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা রঙ্‌বেরঙের তালি দেওয়া আউল-ফকিরদের আঙ্‌রাখার মত। এইরূপ উদারতায় বিসদৃশের মিলন হয় বটে, কিন্তু শ্রীসৌষ্টব হয় না।

হিন্দুর উদারতা প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। একটা মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে এবং পরে সেই মূলতত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মতের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিষ্ঠামূলক উদারতার সুমহৎ দৃষ্টান্তস্থল। বেদান্তের সারতত্ত্ব—এক বই দুই বস্তু পরমার্থতঃ হইতে পারে না—ইহাই গীতার মৌলিক-শিক্ষা। কিন্তু বহুবাদি-সাংখ্যদর্শন, দ্বৈতবাদি-ভক্তিশাস্ত্র, কঠোর যোগসাধন—সমস্তই সেই সারতত্ত্বে গ্রথিত হইয়াছে। গীতা কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণথালের ন্যায়। দুইটি মিলাইয়া এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্বর্য্য-বৈভব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধ মিটান হইয়াছে। গ্রীকেরা বিভিন্ন মতের ভিতর হইতে সাধারণ ভাবটি গ্রহণ করে, রোমীয়েরা অসমানকে পার্শ্বাপার্শ্বি বসাইয়া ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটি মৌলিক দেশ-কালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য সারকথা সেই মূলের মুষায় ঢালিয়া গ্রহণ করে। আমার একটি নৈসর্গিক সুর আছে। বেহালা বা এস্‌রাজের সুরের

সহিত আমার সুর মিশাইয়া মিষ্টতা ও বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাঁচটা যন্ত্রের সংযোগে আমার সুর প্রস্তুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দুজাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দুসন্তানেরা সেই একনিষ্ঠতা—সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

এক জন 'হিন্দু'-শব্দের অর্থ করিয়াছে—"হীন" ও "দূরপলাতক"। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃসত্ত্ব হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার প্রতীকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত?

প্রথমে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। অধ্যাত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বেদান্ত শাস্ত্র এক অপূর্ব্ব, অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বকথা হিন্দুজাতিকে শুনাইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন-গবেষণা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ততত্ত্ব পরিপুষ্ট ও কার্য্যকরী হইবে না। য়ুরোপে অধ্যাত্মদর্শন নাই—ইহা

এক ঘোর প্রমাদ। আপ্লাতুলের (Plato) মত আত্মদর্শী কয়জন জন্মিয়াছে? কান্ত (Kant) ও হেগেলের ন্যায় অদৃশ্যদর্শী অতি বিরল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যায় অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্য-দর্শনকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। কিন্তু জর্ম্মণদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাঁহাকে বিকশিত ও স্ফুটীকৃত করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, বেদান্ত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে এবং জর্ম্মণ হেগেল ও আংশিক কথা বলিয়াছে—দুটা মিলাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—,তাঁহারা সত্য যে কি বস্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর যাঁহারা, বেদান্তেই সব আছে, ম্লেচ্ছদিগকে ঘরে ঢুকাইবার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংস্পর্শ-জনিত ক্রমবিকাশবিধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।*

সমাজসংস্কারবিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই সেই ভিত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিলে কেহ যেন বর্ত্তমান কর্ম্মভ্রষ্ট শত বিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য, গ্রহণ করিব, কিন্তু

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকারী হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। য়ুরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। য়ুরোপে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এদেশে ভোট চালাইব। কিন্তু অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে য়ুরোপের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতি-সাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে বাধ্য করিতে পারে। কোন বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। য়ুরোপের রাজশক্তি তন্তুবায় ও সুরাজীবীদিগের অর্থলালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার ধন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সে-ই ভোটের অধিকারী এবং সেই অর্থগত ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর

রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্ত্তৃপক্ষ এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসন-বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসন-প্রণালীই য়ুরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা জাতীয়তা-ভ্রষ্ট হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য্য-রাজনীতিপ্রথাকেই আমাদের নূতন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও, ক্ষতি হইবে না।

ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া উদারভাবে প্রতীচ্য আদর্শ সকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

হিন্দুজাতির অধঃপতন

ভারতবর্ষের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। কতদিনে যে হইবে, তাহা বলা যায় না। জাতীয় জীবন বৈজ্ঞানিক-ভাবে দেখা আমাদের প্রকৃতিগত নহে। ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিলেই আমরা পুরাণ গড়িয়া ফেলি। কাজে কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যতীত "নাস্তি গতিরন্যথা।" কিন্তু যে দেবতাদিগের উপর আমাদের ষোল-আনা নির্ভর, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় স্বচ্ছ ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এক বিপুল প্রমাদচ্ছবি আঁকিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? য়ুরোপীয় রাজসিক রঙীন লাল চশ্‌মার দ্বারা হিন্দুর সত্বশুভ্র কার্য্যকলাপ ও রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বরূপের পরিবর্ত্তে বৈরূপ্যই প্রতিভাত হইবে। যতগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, সকলগুলিই যেন জোড়া-তাড়া দেওয়া। অনেক অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীকে প্রতীচ্যস্বভাবসুলভ কল্পনাডোরে জোর করিয়া কার্য্য-কারণভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। যখন আমাদের ইতিবৃত্তের এইরূপ দুরবস্থা, তখন ভারতের অধঃপতন-

বিবরণী যথাযথ লিখিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই প্রবন্ধে দুই-একটা কথার অবতারণা করা যাইবে, যাহা ভবিষ্যতে তথ্যনিরূপণকার্য্যে লাগিতে পারে।

য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের পর হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন মত বা প্রথার বিরুদ্ধে যত সংগ্রাম ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহা সকলই ন্যায্য ও বীরোচিত। 'বিদ্রোহ' শব্দটি তাহাদিগকে একেবারে মাতোয়ারা করে। এই য়ুরোপীয় বিদ্রোহিদল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ঘোর বিরোধী; ইহাদের দৃষ্টিতে বেদবিপ্লাবী বৌদ্ধমত অত্যন্ত উচ্চ; কেন না, ইহা পুরাতনকে ভাঙিয়াছে। ক্রমভঙ্গপ্রবণ য়ুরোপীয় বিবেক বেদবিহিত বর্ণধর্ম্মকে মানবকুলের বৈরী বলিয়া ঘৃণা করে, বেদান্তের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবাদকে পরিহাস করে, কিন্তু নাস্তিকবৌদ্ধমার্গকে স্বর্গে তোলে। এই বিদ্রোহ-বিকৃত দৃষ্টিই আমাদের পুরাতন ইতিহাসে অলীকতার আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই হিন্দুস্থানের অধঃপতনের মূল কারণ—এই ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ে ভারতের অভ্যুদয়। বৌদ্ধদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারত কি অন্ধকারময় ছিল না এবং তাহাদিগের তিরোভাবে ভারত কি আবার অজ্ঞানতমিস্রায় আচ্ছাদিত

হয় নাই? ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক বটে, কিন্তু তাহারা কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় সংবদ্ধ নহে।

হিন্দুত্ব দুইভাগে বিভক্ত;—ধর্ম্ম এবং জ্ঞান। ধর্ম্ম ব্যবহারিক; ইহা বিধিনিষেধব্যবস্থাপক। জ্ঞান পারমার্থিক; ইহা চিরপরিনিষ্ঠিত নিত্যবস্তুর পরিচায়ক। বেদ ও সংহিতা ধর্ম্মের আধার। বেদান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্ম্মজ্ঞানবিরহিত হইলে সমাজ ক্ষীণপ্রাণ ও অধোগামী হয়; বাহ্যাড়ম্বর ভাবকে মারিয়া ফেলে; স্থূল সূক্ষ্মের উপর আধিপত্য করে; জড়প্রকৃতি চিদাত্মাকে পদদলিত করে। দুর্দ্দমকালপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জ্ঞানচ্যুতি ঘটিয়াছিল; যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াছিল। জ্ঞানের আদর্শ—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা—যাহাতে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিয়া যায়। এই মহান্ আদর্শে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় হয়। কিন্তু এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে কর্ম্মচক্রের পেষণে পিষ্ট হইতে হয়। ফলসম্ভোগও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। বুদ্ধের আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে হিন্দুসন্তানেরা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গের এষণাতে মুগ্ধ হইয়া মোক্ষবিমুখ হইয়াছিল। পরমার্থবিয়োজিত রসবিবর্জ্জিত সকামবেদবাদরতি তাঁহাদিগকে তেজোহীন করিয়াছিল। এই হীনতার কারণ কি? য়ুরোপীয়েরা বলিবেন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। যত দোষ

নন্দঘোষ। অন্ধকারে ঢিল মারিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যে আদর্শের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা অনিন্দনীয়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রবৃত্তির বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া অদ্বৈতশান্তিসাগরে দ্বৈতকে নিঃশেষ করাই সমগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যদি লক্ষ্য এত বড়, তবে লোকে ইহা ছাড়ে কেন? অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম্মনিয়ন্ত্রিত কালকে জিজ্ঞাসা কর। এই প্রবঞ্চবহুলভবে স্থিতির ভঙ্গ আছেই আছে। সংসারে থাকিয়া কালকে এড়াইয়া কতদিন থাকা যায়। যত বড়ই সমাজ হউক না কেন, কালবশে তাহা নিস্তেজ অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। আর্য্যসন্তানেরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের তরঙ্গকে তুচ্ছ কবিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই উদ্যমের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ বলিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ নহে, কিন্তু কর্ম্মফলবিমুখ। তাহারা কর্ম্মকে ভালবাসে, কিন্তু কর্ম্মসঞ্চিত ঐশ্বর্য্যকে পরিবর্জ্জন করে। কোন্ দেশে বিশাম্পতি চক্রবর্ত্তী রাজা রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিতেন? কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যা-ই জয়লাভ হইত বিত্ত সঞ্চিত হইত, বিনা সংসারচেষ্টায় ফলভোগের সময় আসিত,

অমনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর্য্যগৃহস্থ বনে প্রয়াণ করিত। এই ত যথার্থ কর্ম্মানুরাগ। কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃ-পিতামহাগত ঐশ্বর্য্যের উপর আপনার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইত, তাহা হইলে সেই কাপুরুষ লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হইত। অন্যান্য দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কর্ম্মগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আর্য্যবর্ত্তে কর্ম্মের উপরে পদমর্য্যাদা আলম্বিত ছিল। এ কথা সত্য বটে যে, ফলকামনা ত্যাগ করিলে উদ্যমের উষ্ণতা কমিয়া যায়। অহেতুক প্রেম কিছু শান্ত-দান্ত হয়। অলঙ্কারের জন্য পতিকে ভাল বাসিলে প্রেমের আলোড়নটা অধিক হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলভাবপ্রণোদিত প্রণয় স্থির ও গম্ভীর হইয়া থাকে। আমাদের কর্ম্মানুরাগ অহেতুক, তাই আমরা স্থির ও শান্তিপ্রিয়। আর যাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য কর্ম্মকে ভালবাসে, তাহাদের উদ্যমের জ্বালায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ক্ষুব্ধ ও প্রপীড়িত। আমরা কর্ম্মকেই ভালবাসি। ভালবাসিয়া তাহাকে জয় করিব। যে স্থিরতা ও শান্তিতে কর্ম্মবন্ধ টুটিয়া যায়, তাহাই অবলম্বনীয়। ঐশ্বর্য্যবাসনাসম্ভূত দুর্দ্দান্ত প্রতাপ আমাদের কাজ নাই।

উপরি-দর্শিত হিন্দু-প্রকৃতি, প্রতীচ্য সজ্জনেরা বুঝেন

না বলিয়াই বেদ-বেদান্তের উপর তাঁহাদের এত রোষ। গভীরভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্মেই হিন্দু-জাতির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ে নহে। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মসাধন, বিত্তত্যাগপূর্ব্বক কুলগত কর্ম্মরক্ষা, বার্দ্ধক্যে বনপ্রয়াণ, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে সহজ নহে। তত্রাচ আর্য্যসন্তান ভীত হন নাই;— প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই ফলত্যাগের ফল কি হইয়াছে? বেদান্তবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমসীমা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কাল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। ধীরে ধীরে অসীম চেষ্টার ভিতরে অবসাদ আনিয়াছিল। অবসাদগ্রস্ত হিন্দুসন্তান উচ্চজ্ঞানের পথে আর চলিতে পারেন নাই। অবশেষে কালের জয় হইয়াছিল।

বেদান্তের নিষ্কামধর্ম্ম ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহার অন্য এক কারণ আছে। কালক্রমে আর্য্যে ও অনার্য্যে, দ্বিজে (আর্য্য) ও শূদ্রে সংমিশ্রণ হইয়া বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল; আর্য্যরক্ত দূষিত হইয়াছিল। বর্ণধর্ম্ম ভিন্নকে অভিন্ন করে। প্রথমে দুই এর মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া দেয়; পরে তাহারা যেমন সম্মেলনের অনুকূল অবস্থা লাভ করে, অমনি ব্যবধানটি তুলিয়া দেয়। প্রথমে দ্বিজে ও

শূদ্রে কঠোর প্রভেদ ছিল। ক্রমশঃ তাহারা মিলিয়া গেল; কিন্তু এই মিলনে ভালও হইল, মন্দও হইল। বর্ণসঙ্করগুলি নিষ্কামধর্ম্মের মর্ম্ম তত বুঝিতে পারিল না। আর্য্যসমাজ নিবৃত্তির অনুশাসনে শাসিত ছিল। এই অনুশাসন অভ্যাগতদিগের একটা বোঝা বলিয়া মনে হইত। তাহারা মিশিয়াছিল বটে, কিন্তু আর্য্যনাতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই আগন্তুক অজ্ঞ নিবৃত্তিবিরোধী সঙ্করজাতিসকল আর্য্য-সমাজের বক্ষে একটা গুরুভাবের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই উন্নতির পথ শীঘ্র শীঘ্র রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদারতাই আর্য্যজাতির পতনের কারণ। অনুদার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জন্য হিন্দুজাতি হীন হইয়া গিয়াছে—এইরূপ নিন্দা কাল্পনিক। আর্য্যেরা যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা আছে কি না, সন্দেহ। এমন শাদায়-কালোয় মিলন আর কোথাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

যখন হিন্দুজাতি সংসারসংগ্রামে অবসন্ন হইয়াছিল,—বিষমসম্মেলনে ক্ষীণচেষ্ট হইয়াছিল,—লক্ষ্যবিহীন হইয়া কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তখন বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। তিনি কর্ম্মচক্র হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। ভেদবাদী বৈদিকধর্ম্মের

পরিবর্ত্তে মৈত্রী সংস্থাপন করিতে, ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর দূর করিয়া মনুষ্যজাতিকে যথার্থ ধর্ম্মভাবাপন্ন করিতে, কল্পনাপ্রসূত বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের স্থানে ব্যক্তিগতসাধনসম্ভূত নির্ব্বাণশান্তি দান করিতে, বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই সংবাদ গুরুভারগ্রস্ত আর্য্যজাতির অতি মিষ্ট লাগিয়াছিল। জ্ঞানবিহীন কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগের প্রতিবাদ যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা প্রাচীর ভাঙিতে গিয়া অন্তঃপুর ভাঙিয়া ফেলিল। ভেদভাব দূর করিতে গিয়া হিন্দুর সার ধন আস্তিক্যবুদ্ধি ও বর্ণধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিল। তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে "বৈনাশিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈনাশিক-বৌদ্ধবিদ্রোহ অবসাদের শীতলতাকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। বিশেষত নিম্নস্তরস্থ সঙ্কর জাতিরা মৈত্রীতত্ত্বসংবাদটি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল। তাহাদের শূদ্রত্ব গিয়াছিল বটে, কিন্তু যথার্থ আর্য্যত্ব লাভ হয় নাই। তজ্জন্য আর্য্য-সংহিতাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাহাদের আগ্রহাতিশয্য হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিশুদ্ধবর্ণ আর্য্যেরাও অনেক পরিমাণে বিচলিত হইলেন। অবসাদের আবল্যে প্রপীড়িত হইলে পুরাতনের উপর কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মে,

কোন একটা নূতন পন্থার জন্য প্রাণটা কেমন করে। তাই তেজোহীন আর্য্যরাও বৌদ্ধমত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের আর একটা বিশেষ কারণ আছে। বৌদ্ধদিগের বৈনাশিকতা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিল। বুদ্ধ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া উপাসিত হইতে লাগিলেন। শ্রমণেরা আচার্য্য হইয়া বসিলেন—সংহিতার পরিবর্ত্তে ধম্মপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। শঙ্খঘণ্টাধূপদীপসমন্বিত গৈরিকবাসাবৃত শূন্যবাদ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিল। হিন্দুরা ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের আকার দেখিয়া ভুলিয়া গেল। আর সেই যোগীবাঞ্ছিত নির্ব্বাণমুক্তির কথা কোন্ হিন্দুকে মুগ্ধ না করে? কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তির ভিতর হইতে যে শুদ্ধাদ্বৈতরস ব্রহ্মজ্ঞান ছঁাকিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা আর্য্যেরা বুঝিতে পারেন নাই। না বুঝিয়া বাগ্‌জালে জড়িত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের বৈনাশিকতা (Nihilism) ভারতে কখনই স্থান পাইতে পারে না। ইহা আসুরিক ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা ধর্ম্মকে পদদলিত করে, ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। বৌদ্ধবাদ নাস্তিকতা হইলেও ধর্ম্মের আকারে আসিয়াছিল বলিয়া গ্রহণীয় হইয়াছিল।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতার পরিপোষক, তবে ভারত কেমন করিয়া বৌদ্ধপ্রভাবে জাতীয় মহত্ব লাভ করিয়াছিল। মগধরাজ্যের মহিমা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? রাজনীতির পরিপুষ্টি, বাণিজ্যের বৃদ্ধি, সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রা, আরোগ্যালয়প্রতিষ্ঠা, সার্ব্বজনীনবিদ্যালয়-সংস্থাপন, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি, বৌদ্ধভারতেই হইয়াছিল। নাস্তিকতার কি এত শুভ বল আছে?

সুবিচারদৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাস্তিকতার বা উচ্ছৃঙ্খলতার শুভ বল নাই,—মঙ্গলকারিতা নাই, কিন্তু একটা রাজসিক তেজ—উদ্দাম চেষ্টা আছে;—যাহার নিকট আস্তিক্যবুদ্ধিজনিত ধর্ম্মবিধি-নিয়মিত স্থির গম্ভীর মঙ্গলভাব পার্থিব ব্যবহারে হার মানিয়া যায়। গৃহত্যাগী স্বেচ্ছাচালিত বিধিবহির্ভূত বালক গুরুজনবশগ বালকের অপেক্ষা সাহসে, উদ্যমে, ক্ষিপ্রকারিতায়, বিঘ্নবাধাজয়ে ব্যবহার পটুতায়, নির্ম্মাণ-দক্ষতায় নিশ্চয়ই গরীয়ান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কর্ম্মকুশলতার আতিশয্য, বুদ্ধিকে স্থূল ও পাশব করিয়া ফেলে, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানকে নাশ করে। আর কুলশীলবান্ বালক অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে ও অবশেষে সুদৃঢ় আত্মস্থিতি লাভ করে। স্বৈরিণী শক্তির মধ্যে বিনাশবিষ নিবিষ্ট থাকে। তাই তাহার মত্ততা ও আস্ফালন অধিক।

কিন্তু আস্ফালন মরিবার জন্য। সুনিয়মিত শক্তির ঘটা ও আড়ম্বর অল্প, কিন্তু স্থায়িত্ব অমর। আজ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কোথায় বা সেই মগধরাজ্য, কোথায় বা ধম্মপদ ও ত্রিপীটক।—সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নিপীড়িত, অবসন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছে। যেরূপ শীতপ্রধান দেশে তুষারগর্ভে পুষ্পলতার বীজ-সকল হিমের অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকে ও বসন্ত-সমাগমে পুনরঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর্য্য-প্রকৃতিগর্ভে রক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্করপ্রমুখ সন্ন্যাসী-দিগের আহ্বানে আবার জাগরিত হইয়াছে।

জাগরিত হইল বটে, কিন্তু সে পুরাতন তেজ ফিরিয়া আসিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যজাতির ঊর্দ্ধদৃষ্টিকে নীচগামী করিয়া দিয়াছিল। শূন্যবাদের কচ্‌কচিতে উপনিষদের গভীর জ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল। হিন্দুর নিবৃত্তির দিকে আর মন ছিল না। আস্তিক্যবুদ্ধিবিরহিত হইয়া আর্য্যসন্তানেরা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন তাঁহার বেদান্তের ভেরী বাজাইলেন, তখন মৃতকল্প ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সঞ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণশক্তির সঞ্চার হইল না। হিন্দুসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অসাড় হইয়াছিল। জীবন প্রবাহ

বহিল, কিন্তু অতি ক্ষীণধারে। বেদান্তের জ্ঞান পুনরুদ্ধৃত হইল, কিন্তু জনসাধারণে তাহা বুঝিল না। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুর চরিত্রকে এত কলঙ্কিত করিয়াছিল যে, কামনা-বিবৰ্জিত সাধন তাহাদের নিকট অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নিবৃত্তিমার্গ আর তাহাদের ভাল লাগিল না। শত শত সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তিমার্গ দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হিন্দুরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর একতা রহিল না। যখন জ্ঞানে ঐক্য নাই, লক্ষ্যে ঐক্য নাই, তখন ব্যবহারে কিরূপে থাকিতে পারে ? ঐক্যবিহীন হইয়া যবনদিগের পদানত হইতে হইল।

রাজনৈতিক অনৈক্য অপেক্ষা পারমার্থিক অনৈক্য হিন্দুজাতিকে অধিকতর হীন করিয়াছে। আর্য্যমাত্রেরই বেদাধ্যয়নের অধিকার ছিল। সকলেই একমেবা-দ্বিতীয়ের তত্ত্ব শিক্ষা করিত। বেদগাথা গাহিত, উপনিষদের মন্ত্র অভ্যাস করিত। তাহাদের মধ্যে সংসারের কর্ম্মে, ব্যবহারে, পদমর্য্যাদায় প্রভেদ ছিল, কিন্তু পরমার্থ-বিষয়ে সমানাধিকার ছিল। পিতার সহিত সকল সন্তানেরই—জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর, সুশ্রী বা বিশ্রীর, ধনী বা দরিদ্রের—তুল্য সম্বন্ধ। পুত্র অজ্ঞানী বলিয়া ভৃত্য বা কোন ইতর পুরুষকে পিতৃত্বে বরণ করে না ; পিতাকেই

পিতা বলে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঋষিবংশসম্ভূত নবীন হিন্দু উপনিষদের সরল-গম্ভীর তত্ত্ব আর বুঝিতে পারে না। কেবল জনকতক লোকে বুঝে। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নূতন প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহভয়ে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়াছিলেন। অজ্ঞজনের হস্তে বেদরূপ খনিত্র দেন নাই, পাছে আবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় ধর্ম্মের মূল খুঁড়িয়া ফেলে। এই ব্যবস্থার ফল বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক ভেদবাদী ও প্রবৃত্তিমার্গের উপাসক হইয়া যাইতেছে। যতদিন না আর্য্যসন্তানেরা পূর্ব্বের ন্যায় পরমার্থবিষয়ে এক হয়, ততদিন ভারত অধোগামী থাকিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে ভারতের অধঃপতনের মূলকারণ তিনটি—(১) অহৈতুককর্ম্মজন্য নৈসর্গিক অবসাদ ; (২) আর্য্যানার্য্যের অত্যুদার সম্মেলন ; (৩) বৌদ্ধবিদ্রোহ। য়ুরোপীয়েরা ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুজাতির কর্ম্মবৈমুখ্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুদারতা ও বৈদিক আশ্রমধর্ম্মের পুনারাবির্ভাব—এই তিন কারণে ভারতবর্ষ পতিত হইয়াছে। এই বিদেশীয় সিদ্ধান্ত আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে,

আমরা কর্ম্মবিমুখ। তজ্জন্য আমরা আর্য্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ গ্রহণে উৎসুক হইয়াছি। সঞ্চয়ের জন্য কর্ম্ম না করিলে বিজিগীষা Competition) হয় না ; আর বিজিগীষা না হইলে হুড়োহুড়ী, মারামারি, কাটাকাটি হয় না,—কর্ম্মের ভূমি প্রসারিত হয় না,—ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না। বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মে বিজিগীষার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, অতএব বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া বর্ণধর্ম্মকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও। এই ভয়ানক ম্লেচ্ছভাব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়াছে। বৌদ্ধবিদ্রোহে হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে ; এইবারকার বিদ্রোহে হিন্দুজাতি একেবারে বিনষ্ট বা হয়। এই ঘোর সঙ্কটে আর্য্য আদর্শ পুনরুদ্ধৃত না করিলে নিশ্চয়ই কালকবলে পড়িতে হইবে। আশ্রমধর্ম্ম সেই আদর্শে গঠিত। কুলগত কর্ম্ম ও সঞ্চয়ে অনাসক্তি, বর্ণধর্ম্মপালনে পরিপুষ্ট হয়। বর্ণধর্ম্মভঙ্গেই জাতীয় হীনতা আসিয়াছে। যতদিন হিন্দুসন্তান আশ্রমী হইয়া কর্ম্মফললিপ্সা পরিবর্জ্জন করিয়া কর্ম্মনিষ্ঠ না হয়, ততদিন ভারতের উত্থান দুরাশামাত্র। আশা করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই একটা চিরপ্রচলিত ঐতিহাসিক ভ্রম দূর হইতে পারে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিলেই ভ্রাতৃভাবাপন্ন নব্য সভ্যেরা নাসিকাগ্র আকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। আজকাল জাতিভেদ-সমর্থন চেষ্টা অঙ্গলীভূত (anglicised) হিন্দুর নিকট ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদবিহিত বর্ণধর্ম্ম এক্ষণে হাস্যপরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রায়মহাশয়ের বংশদণ্ড-বিপণীই উপজীবিকা। কিন্তু পংক্তিভোজনকালে তিনি তাঁহার বংশমর্য্যাদারক্ষণে অতিশয় পটু। লক্ষপতি বসুজাই হউন, আর বেদান্তজ্ঞ দত্তজাই আসুন—সাধ্য কি যে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সপিষ্টক কদলীপত্র অধিকার করেন। অর্থ বা বিদ্যার বলে বংশদণ্ড-প্রহারবেদনার অতীত হওয়া যায় না। আহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কি প্রভাব!

স্থূলকায় স্বেদস্রাবী হস্তিমূর্খ—মারিলে কোঁক করে না, পাছে "ক" উচ্চারণ হয়—ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভক্ষণে বর্ণধর্ম্ম সম্মানিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গৌরতনু

শুভ্রবাসা সুবিদ্বান্ অংগলদেশবাসীর সহিত একটু শ্যামপর্ণিরস (চা) পান করিলে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।

এই ত তোমার বর্ণধর্ম্ম। ধিক্ হিন্দুত্বকে, যাহা এই বিষমবাদ পোষণ করে।

সাম্যবাদী সভ্যদলের এইরূপ নিন্দাবাদ সাদরে স্বীকার করি। স্বীকার করি বলিয়াই সাহসের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, বংশদণ্ডব্যবসায়ী রায় মহাশয় ও হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণবর ও নব্য হিন্দুসন্তান—তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মনাশে বদ্ধপরিকর হওয়াতে ভারতের পুনরভ্যুত্থান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি গত বৈশাখমাসে—হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা—এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা হিন্দুত্বের ভিত্তি। একনিষ্ঠতা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখা—একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা। কিন্তু কি প্রকারে এই একনিষ্ঠতা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে পর্য্যালোচিত হইবে।

কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে অল্পসল্প ধৈর্য্যের প্রয়োজন। তবে ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে।

য়ুরোপীয় বেশধারী কালা বাঙালী প্রকৃতপক্ষে সাহেব হইতে পারে কি না, অথবা দাঁড়কাক ময়ূর হইতে পারে কি না – এবম্প্রকার প্রশ্ন কেহ যদি উত্থাপন করে, তাহা হইলে প্রশ্নকারীকে সাহেবী-ভাষায় দুই-একটা গালি না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেইরূপ বর্ণধর্ম্মকে ঘষিয়া মাজিয়া খাড়া করা যায় কি না, আর কালাকে সাদা করা যায় কি না—এ দুই একই কথা। জাতিভেদটা আগাগোড়া অত্যাচারে ভরা। অত্যাচারে ইহার জন্ম, অত্যাচারে ইহার পুর্ত্তি। মনুস্মৃতি যতদিন থাকিবে ততদিন ভ্রাতৃবিদ্বেষজনিত বৈষম্যের ছবি হিন্দুধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবে। শূদ্রকে পশুর অপেক্ষা নীচ করা, আর ব্রাহ্মণকে দেবতার অপেক্ষা বাড়ান—ইহাই ত বর্ণধর্ম্মের সারতত্ত্ব। বড় বড় য়ুরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও দিগ্‌গজ দেশী সংস্কারকেরা যাহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার বিপক্ষে বলিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এতটা যখন অধীরতা, তখন পর্য্যালোচনা চলা বড় শক্ত কথা। তজ্জন্য প্রথমে ধৈর্য্যের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

শূদ্রজাতিবিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। পূরাকালে কৃষ্ণকায় কাষ্ঠপ্রস্তরভূতপ্রেতাদিপূজক অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত।

তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে পাছে আর্য্যরক্ত দূষিত হয় ও সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদধর্ম্মের বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে দূরে দূরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন উচ্চজাতির সহিত বিরুদ্ধধর্ম্ম ও নীচজাতির সহসা সম্মেলনে ক্রমোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। গরীয়ান্ অংশ লঘু হইয়া পড়ে ও লঘীয়ানেরও স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া যায়। সঙ্করসৃষ্টিবিভ্রাট নিবারণের জন্যই সংহিতাকারেরা শূদ্রজাতিসংস্পৃষ্ট অন্নপানীয় পর্য্যন্ত পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন। আমাদের স্বভাব এই যে, যাহাদের সহিত আমাদের আহারপান, তাহাদের সহিত আমাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। আমাদের নিকট আহার-সংসর্গ সামাজিক সমতার পরিচায়ক। এই প্রাচ্য সহৃদয়-তার বেগ বিধিনিষেধাদি দ্বারা সুনিয়ত হওয়াতে, আর্য্য-জাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম ও শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছিল। যদি দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের সহিত আচার ব্যবহার সুদৃঢ়-রূপে বিধিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যেটুকু আর্য্যত্ব অবশিষ্ট আছে, তাহাও থাকিত না। বীরপ্রসূ রাজপুতানা আজ চেপ্টা নাক আর পিঙ্গলাক্ষিতে ভরিয়া যাইত। কমলমুখী হিন্দুরমণীর স্থানে টিপ্‌কপালী ও উনানমুখীরা কাব্যকানন শোভিত করিতেন। ইহুদি-

বিধিপ্রবর্ত্তক মুশা অনীশ্বরোপাসক ইতরজাতিগণকে যত কঠোররূপে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতাকার-গণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত্র সভ্য মার্কিনদেশে শ্বেতচর্ম্ম কৃষ্ণচর্ম্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান আছে, পুরাকালে আর্য্যে ও অনার্য্যে তত প্রভেদ ছিল কিনা সন্দেহ। এরূপ সামাজিক ব্যবধান ত অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। মেলন-প্রবৃত্তি যদি স্বৈরিণী হয়, আর কোন প্রকার বিধি না মানে, তাহা হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চালয়া যায়। অংগলদেশে সেদিন যে নবঘনশ্যাম স্থূলোষ্ঠ কাফ্রিরাজ-কুমার শ্রীমান লবঙ্গূলকে পূর্ণচন্দ্রপ্রভা বিম্বোষ্ঠা ইংরেজ-কুলোদ্ভবা কোন শ্রীমতি বরণ করিবেন বলিয়া ধর্ম্ম-যাজকদের মধ্যে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কি বিশেষ নিন্দার বিষয়? আজ যদি ইংরেজেরা এইরূপ বিবাহের প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহাদের জাতীয় হীনতা ও বিকৃতি কি হইবে না? বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানত বর্ণসঙ্কর-সৃষ্টিভয়েই এই আর্য্যানার্য্যের মধ্যে আহারপানাদিসম্বন্ধীয় ব্যবহারগত ভেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরমার্থ-হানির ও ভয় ছিল। কেন না, অনার্য্যেরা সংস্কারহীন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেমন আধুনিক

মার্জ্জিতমতাবলম্বীরা কুসংস্কারবশতাপন্ন পরিবারে কন্যা-দান করিতে কুণ্ঠিত হন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পারলৌকিক ইষ্টহানির ভয়ে শূদ্রগণের সহিত আদানপ্রদান করিতেন না।

কিন্তু এই ভেদজন্য কঠোরতা ক্রমশ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনার্য্যেরা আর্য্যসহবাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতা বাড়িতে লাগিল। মনুর বিধি-অনুসারে—যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাহা-দিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায় (মনুসংহিতা—৪, ২৫৩)। দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত এক জমিতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়), নাপিত এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য (যাজ্ঞবল্ক্য—১৬৫)। পরাশরসংহিতাতেও একাদশ অধ্যায়ে শূদ্রের অন্ন ভোজ্য এইরূপ বিধি আছে। শূদ্রসম্বন্ধে ব্রাহ্মণসংহিতায় যে অনুদারতা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক।

য়ুরোপীয়ের নিকট কালো রংই শূদ্রবর্ণ। আমাদের বর্ণধর্ম্মবিদ্বেষী ভ্রাতৃভাবাপন্ন সংস্কারকদের দল থেকে খুব কালো কালো জনকতক বাচাই করিয়া যদি একটা বিলাতে উপনিবেশ (colony) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সাহেব-মহোদয়দিগকে আগন্তুক ভ্রাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাস রোধ করিবার জন্য দুই চারি খানি মনুসংহিতা অপেক্ষা কড়াকড়া শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন আমাদের সংস্কারকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, সাহেবদের বাচনিক ভ্রাতৃভাবের চোটে হিন্দুজাতির হীনতা স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের নামটা ডুবান বড় ভাল কাজ হয় নাই।

আরও দেখা যায় যে, এই আহারপাননিষেধ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের জল পর্য্যন্ত ছুঁইতে নাই—এইরূপ কঠোর বিধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটা জাতিবিভ্রাট ঘটিয়া যাইত। শনি যেমন স্নানের জলের ছুতা করিয়া শ্রীবৎস রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি মুসলমানেরা পানীয় জলের ছুতা করিয়া তাহাদের হিন্দুরমণীপরিণয়লিপ্সা চরিতার্থ করিয়া ফেলিত। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, অন্নভোজন আমাদের কাছে সামাজিক নৈকট্য অথবা মিলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচারক; সাহেবদের নিকট তাহা নহে।

তাহারা তাহাদের জুতাবরদারদের হাতে খাইতে পারে। আমাদের নেতারা তাই গোড়া মারিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমানের সব লওয়া হইল—পোষাক, ব্যবহার, বিদ্যা, রীতিনীতি, কিন্তু জলটা বন্ধ। এই কঠোরতা আমাদিগকে বাঁচাইয়াছে। আজকাল আবার য়ুরোপের প্রভাব। এখন আমাদের কেহ নেতা নাই। তাই সাহেবি খানা খাইবার বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয়েরা বড় গর্ব্বিত জাতি, তজ্জন্য আমাদের বড় একটা গ্রাহ্য করে না। আমাদের সভ্যদলের তাহাদের উপর যেরূপ টান, তদ্রূপ যদি তাহাদের আমাদের প্রতি টান হইত, তাহা হইলে আজ কত শত শ্রীমতী হেমলতা ও মৃণালিনী, মিসেস্ ফক্স্ (Mrs. Fox) ও মিসেস্ হগ (Mrs. Hogg) হইয়া যাইত, আর দেশটা জবরজঙ্গী জাত্ ফিরিঙ্গিতে ভরিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয়েরা একলষেঁড়ে, তাই রক্ষা। কিন্তু কি জানি কোন্ দিন বা তাহাদের ভ্রাতৃপ্রেমের উদয় হয়। তাই আগে থাকিতে পঞ্চগব্যের ভয় দেখাইয়া খানাটা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়।

এইত গেল আর্য্যানার্য্যের ভেদবৃত্তান্ত। মিলনে উন্নতি হয়, কিন্তু মিলন ঘটিবার পূর্ব্বে মেলনীয় বস্তুর কতকটা পরিপুষ্টি আবশ্যক। সেই পরিপুষ্টির জন্য

ভেদব্যবধানের প্রয়োজন হয়। একথাটা সত্য বটে। কিন্তু বংশদণ্ডব্যবসায়ী রায় মহাশয়কে বা হস্তীমূর্খ ব্রাহ্মণসন্তানকে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়; তাহা কি ঘোর অন্যায় নহে? ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই হইল। তাহার কর্ম্ম দেখিবার আবশ্যক নাই, জন্ম দেখিলেই হইবে। ইহা কে অস্বীকার করিবে যে, জন্মগত মর্য্যাদাই বর্ণভেদের মূল? এই অসঙ্গত অন্যায্য প্রথা যে মানব সমাজে কখন চলিয়াছে বা চলিতে পারে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইরূপে বর্ণভেদবিধি কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলে ভাল হয় না?

স্থিরোভব।

সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই বর্ণমর্য্যাদা নষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন—চোর, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য, প্রতিমাপরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী, বাণিজ্যজীবী, রাজভৃত্য, কুসীদজীবী, পশুপালক, মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা, নিষ্ঠুরভাষী, সোমলতাবিক্রয়ী, ও মদ্যপপ্রভৃতি আচারহীন ও উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণগণকে দৈব ও পৈত্র উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে। (মনুসংহিতা —৩,১৫০ হইতে ১৮৩)। পরাশরসংহিতানুসারে উপাসনাবর্জ্জিত বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণকে বৃষল বলে। আর্য্যসন্তানদিগের নিকট কুলগত কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা

অধিকতর কাপুরুষতা আর কিছুই ছিল না। কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ—এই বাক্য শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর শোণিতপ্রবাহ খরতর না বহিতে থাকে? বর্ণধর্ম্ম কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া মর্য্যাদাকে কেবল কুলেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠা কেবল কুলগত ছিল, কর্ম্মগত ছিল না, এরূপ মত ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা হইতে পারে না, তবে কেবল গুণ বা প্রবৃত্তি বা নৈসর্গিক পটুতা দেখিয়া কর্ম্মবিভাগ কেন করা হয় নাই? কর্ম্মকে কেন কুলানুযায়ী করা হইয়াছিল? কুলের গুণদড়ি দিয়া গুণকে বাঁধিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? এই বাঁধাবাঁধিতেই আর্য্যদিগের প্রতিভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুলগত কর্ম্মরক্ষাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে।—এই অপবাদ সত্য নহে। বেগবত্তি স্বৈরগতি কর্ম্মনদীকে কুল দিয়া বাঁধিয়া রাখাতে ভারত ডুবিয়া যায় নাই, কিন্তু সমৃদ্ধিশালীই হইয়াছিল। বরং কুলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে ভারতের শ্রী ভাসিয়া গিয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মকে কেন কুলগত করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী, হিন্দুর দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই, দুই নহে। একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমগ্র বেদগাথায় একেরই মহিমা বর্ণিত আছে। অগ্নির দেবতা অগ্নি, বায়ুর দেবতা বায়ু, সূর্য্যের দেবতা সূর্য্য। কর্ত্তাই কার্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত, স্রষ্টাই সৃষ্টিরূপে প্রতিফলিত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, দাতা, গ্রহীতা ও দান—এই তিনের পারমার্থিক একত্ব বেদমন্ত্রে আভাষিত হইয়াছিল, আর বেদান্তের আনন্দ-জ্যোতিঃতে বিলীন হইয়া ব্যবহারিক ত্রিত্ব-সমূহ বস্তু-ঘটিত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আজকাল য়ুরোপীয় বিদ্যা শিখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কাজ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিন্দুর পরম আদর্শ। প্রতিষ্ঠা,—স্থিতি,—টিঁকিয়া থাকাই, অস্থির স্বরূপ। প্রতিষ্ঠার অভাবে,—স্থিতির অপূর্ণতা-পূরণে,—টিঁকিয়া থাকার বিঘ্ন-অপসারণে, কর্ম্ম বা চেষ্টা বা সাধনার উদ্ভব হয়। কার্য্য অভাবসূচক, অপূর্ণতার

পরিচায়ক। যেখানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা,—যেখানে আত্মস্থিতি, সেখানে কার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—অস্তিত্ব কি তবে স্বার্থেই পূর্ণতা লাভ করে? প্রেমহীনতায় কি অস্তিত্বের চরম বিকাশ? যদি প্রেম ছট্‌ফট্‌ করাতেই হয়,—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্খার অতৃপ্তিতে হয়,—মিলনের পর্য্যাপ্তিতে না হয়, তবে প্রেমের অভাবই অস্তিত্বের সার। আর যদি ভিন্নতাকে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া স্থিতির নাম প্রেম হয়, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া, চেষ্টাকে পূর্ণস্থিতিতে পরিণত করিয়া, দ্বৈতকে নিঃশেষ করিয়া, অদ্বৈতানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্য্যদিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কর্ম্ম করিলে দ্বৈতচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, আর নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়,—আত্মস্থিতির দ্বার উন্মুক্ত হয়,—অদ্বৈতব্রহ্মপদ নিকট হয়। তজ্জন্যই গীতাশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যসমাজকে ধীরে ধীরে এই আদর্শমুখীন করা আশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

নিষ্কাম কর্ম্মসাধনের নিমিত্ত চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে ভোগবাসনা সুসংযত

হইত, দৈন্যভার বহন করিয়াও কুলধর্ম্মরক্ষণে জিগীষা-প্রবৃত্তি সুশমিত হইত, বার্দ্ধক্যে পুত্রকলত্রবর্জ্জন করিয়া, —কষ্টসাধ্য বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রয়াণে কামনার গ্রন্থি ছিন্ন হইত, স্বর্গসুখ তুচ্ছ হইত, ভূমানন্দে ডুবিবার জন্য আয়োজন হইত। বানপ্রস্থাশ্রমের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া হর্ষশোকের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া, মানাবমানের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, জয়পরাজয়ের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যেই ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইল, অমনি সকল সুখভোগে বিরক্ত হইয়া আর্য্যগৃহস্থেরা বনে প্রস্থান করিতেন। তাঁহারা কর্ম্মের অধিকারী ছিলেন, ফলের অধিকারী ছিলেন না। গীতার উপদেশ—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই গীতানির্দ্দিষ্ট আদর্শে সমস্ত আর্য্যজীবন সুনিয়মিত ছিল। বর্ণাশ্রমও এই কর্ম্মফলত্যাগব্রত-উদ্‌যাপনের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছিল।

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর। যদি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা মরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারে আসিত, তাহা হইলে সমাজের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া যাইত। ব্যক্তি মরে, কিন্তু তাহার যদি কোন

প্রতিষ্ঠা বা সঞ্চয় থাকে, তাহা মরে না। তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহা পায়। এই সামাজিক নিয়ম বিশ্বজনীন।

আর্য্যগৃহস্থ যখন বনপ্রয়াণকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কর্ম্মোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার জ্বলন্ত—জীবন্ত ত্যাগের উদাহরণ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিত যে, কর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অবস্থিত; —কর্ম্মফলভোগে নয়। এই বানপ্রস্থাশ্রমবিহিত ঐশ্বর্য্য-ত্যাগে কর্ম্মের প্রতি এক মঙ্গলময় অভিমান জনিত হইত। যে-সে কর্ম্মে অভিমান জন্মে না। যে কর্ম্মের দ্বারা আমার পিতৃপুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যে কর্ম্ম পালনে সমস্ত ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ধন যায়,—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তত্রাপি কৌলিক কর্ম্ম ছাড়িব না। যদি কর্ম্মকে ফললিপ্সা-সঙ্গদোষ-বিবর্জ্জিত করিয়া কুলগৌরবে গরীয়ান্ না করা হইত, তাহা হইলে সমগ্র সমাজকে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ করা অসম্ভব হইত। মর্য্যাদার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পরমার্থে লইয়া যাইতে হয়। আত্মমর্য্যাদা না হইলে পরমার্থদৃষ্টি ফুটে না। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোককে সুপথে লওয়া বড় কঠিন

ব্যাপার। তজ্জন্যই দূরদর্শী ঋষিরা কুলমর্য্যাদা ও জাতি-গত প্রতিষ্ঠার তেজোময় অভিমানবলে আর্য্যসমাজকে চালিত করিয়াছিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সেই কর্ম্মাভিমানবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আজও শত শত ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা দৈন্যভারগ্রস্থ,—উদর-জ্বালায় ব্যতিবস্ত, কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অপক্ক রম্ভার উপদ্রব এড়াইয়া ক্ষীরসরনবনীত-ভোজনে পরিতুষ্ট হইতে পারেন, তথাপি পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। গৃহে ব্যঞ্জন নাই; গৃহিণী তিন্তিড়ীপর্ণ রন্ধন করিয়া দেন; আপনারা তাহা আনন্দের সহিত ভোজন করেন ও শিষ্যদিগকে ভোজন করান। মরিয়া যাইবেন, সেও ভাল তবু বিত্তগ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিবেন না! আসুন সকলে মিলিয়া চোগাচাপকানধারী পরধর্ম্মী ব্রাহ্মণদিগকে দূর হইতে সম্মান দিয়া, সেই কুলধর্ম্মপালক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করি। তাঁহারা দীন বটেন, কিন্তু হীন নন। তাঁহাদিগের সম্মানে;—তাঁহাদিগের গৌরবে আর্য্যঋষিদিগের সম্মান ও গৌরব হয়। আজও শতসহস্র ক্ষত্রিয় দেখা যায়, যাঁহারা অন্নের জন্য লালায়িত কিন্তু তরবারি ছাড়িয়া জীবিকার্থে লেখনী ধারণ করিতে ঘৃণা করেন। আর আজ যদি আমাদের বণিকেরা কুলধর্ম্ম ছাড়িয়া দু-চার-পাতা ইংরাজি

উল্টাইয়া উকিল-ডেপুটী হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িত। এখনও কুলগত কর্ম্মাভিমান হিন্দুজাতির গৌরবকে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে, ভারতকে অশেষ দৈন্য হইতে বাঁচাইয়াছে।

ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মকে ভালবাসা, নিষ্কামকর্ম্ম-সাধনে কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন করাই, হিন্দুর হিন্দুত্ব। যাঁহারা নিষ্ক্রিয় পূর্ণ অদ্বৈতানন্দে ডুবিতে চান, তাঁহারাই এই উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

কর্ম্মনদীর চঞ্চলপ্রবাহ জ্ঞানসাগরে মিশাইয়া না গেলে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না। আবার কামনা থাকিতে কর্ম্মের ঘুর্ণীপাক শেষ হয় না। কর্ম্মবিতাড়িত সংসারোর্ম্মি হইতে রক্ষা পাইবার কর্ম্মই প্রশস্ত উপায়—যদি তাহা কামনাদুষ্ট না হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে পুত্রবিত্ত ও স্বর্গের এষণা পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। চেষ্টা, সাধনা, কার্য্য প্রাণপণে করিবে, কিন্তু সঞ্চয়ের অধিকারী হইবে না। এরূপ বাসনাবিরহিত উদ্যম সহজ কথা নহে। কর্ম্মের উপর বিশেষ প্রীতি না হইলে, তাহা সম্ভব নহে। এতটা ভালবাসা চাই যে, কর্ম্মকে কোন অবান্তর বস্তুর সংমিশ্রণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক অভিমানের বেড়া দিয়া বেষ্টন করিতে পারা যায়। আর্য্যসমাজ সেই অভিমান

কুলমর্য্যাদা হইতে, পিতৃপুরুষদের গৌরব হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই কুলমর্য্যাদারক্ষণপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই প্রীতিপূর্ণ বংশাভিমানের ডোরে পূর্ব্বপুরুষ ও ভাবী সন্ততিগণ যথান্বয়ে বদ্ধ আছে। শোণিতের টান মৃত, জাত ও অজাত ব্যক্তিগণকে কৌলিক বা জাতীয় একত্বে আকৃষ্ট করে। এই শোণিতগত, বংশগত, জাতিগত, মর্য্যাদাপরিপুষ্ট, অভিমানসংরক্ষিত একতাই মানব-সমাজের ভিত্তি। আর্য্যেরা এইভাবের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া কুলকর্ম্মসূত্রে সমাজকে বাঁধিয়াছিলেন। সভ্য য়ুরোপেও এই বংশমর্য্যাদার যথেষ্ট পরাক্রম আছে, কিন্তু তথায় জিগীষা, প্রতিযোগিতা, ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, প্রাবল্য পাইয়াছে। ভূতপ্রপঞ্চকে জয় করা, প্রকৃতিকে বশ করা, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দমনীয় সংসারে প্রভুত্ব লাভ করা—য়ুরোপের আদর্শ। এই আদর্শ যে মহান্ ও প্রশংসার্হ তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃতিকে ব্যবহার ক্ষেত্রে জয় করা পরমার্থলাভের আর এক প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই আদর্শ ঈশার আদর্শ নহে। ইহা য়ুরোপীয় স্বভাবসুলভ, কিন্তু ঈশা-প্রণোদিত নহে। ইহা ঈশার আদর্শের একটা কার্য্যভূমি মাত্র। অনেক সময়ে দুই আদর্শে ভয়ানক বিরোধ ঘটিয়াছে: কখন য়ুরোপের জয় হইয়াছে, কখন ঈশার জয় হইয়াছে। য়ুরোপের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

এই জয়পরাজয়ের ইতিহাস। এই দুই আদর্শের প্রভেদ জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা না হইলে য়ুরোপীয় ইতিহাস-তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইবে। ভারতের আদর্শ কর্ম্মজয়, ঐশ্বর্য্যলাভ নহে। তাই এখানে কর্ম্মের এত অভিমান, বর্ণধর্ম্মের প্রতি এত ভালবাসা, জিগীষার অনাদর, শান্ত-ভাবের আদর। য়ুরোপের আদর্শ জয়; তাই সেখানে শান্তভাবের এত অভাব, প্রতিযোগিতার এত বাহুল্য। হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ভেদপ্রসূ কর্ম্মবীজকে নাশ করিয়া অভেদানন্দ লাভ করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মসাধন অবলম্বন করিয়াছিল, আর এই একনিষ্ঠতাই বর্ণবিভাগ-ক্রমের প্রণোদনা করিয়াছিল।

অদ্বয়াত্মা মায়াপ্রভাবে অন্নময়াদিপঞ্চকোষে প্রবিষ্ট হইয়া অহম্প্রত্যয়ী জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পঞ্চকোষ আছে, তদ্রূপ সমাজেরও পঞ্চকোষ আছে। জীবের অন্নময়কোষ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমাজের শ্রমসেবাজীবীদিগের অনুরূপ; প্রাণময়কোষ বাণিজ্যজীবীদিগের সদৃশ। কেন না, ক্রয়বিক্রয়জন্য আদান-প্রদানে সমাজ বাঁচিয়া থাকে। সমাজের শাসন-রক্ষণকারীদিগের দল মনোময় কোষের তুল্য। মন ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া চালন করে; ক্ষত্রিয়েরাও প্রজাদিগকে শাসন করে। ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞানময় কোষ-

প্রতিম; কারণ বিজ্ঞানময়-বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী। তাঁহাদিগের বিশেষ কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন, তাঁহারা শিষ্যদের অন্তঃকরণকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যান, অন্তর্দৃষ্টি উদ্ঘাটিত করেন, মনের সঙ্কল্পবিকল্পকে একমুখীন করেন। সন্ন্যাসীরা আনন্দময় কোষপ্রতিম। তাঁহারা অত্যাশ্রমী বিধিনিষেধাদির অতীত, যদৃচ্ছাগতি; সংসারের পরমার্থগতির মুখ্য ভার তাঁহাদেরই উপরে ন্যস্ত। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি, আনন্দতেই স্থিতি, আনন্দতেই বিশ্ব সংসারের পর্য্যবসান। তাই যাঁহারা ত্যাগানন্দভুক্, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রভু, জগদ্গুরু।

ঋষিরা একমেবাদ্বিতীয়ের কৌষিক পঞ্চীকরণ অনুসারে সমাজকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়াছেন; আর ব্যক্তিরও যে সাধন, সমাজেরও সেই সাধন ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সপ্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশে আনিতে হয়; তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে মনের অধীন করিতে হয়; বহির্মুখী মনকে আবার অন্তর্মুখী বিবেকের শাসনে রাখিতে হয়, তবে আনন্দের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নহিলে বিরোধ, বিদ্রোহ ও বহুলতার উপদ্রবে জীব ক্লিষ্ট ও মঙ্গলভ্রষ্ট হয়। আর্য্যসমাজেও সেইরূপ ছিল। চতুর্ব্বর্ণের পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ জীবকোষানুযায়ী ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলকে জ্ঞান শিক্ষা

দিত, ক্ষত্রিয়েরা সকলকে রক্ষণ করিত ; বৈশ্যেরা সকলের জন্য আহরণ ও উপার্জ্জন করিত ও শূদ্রেরা সকলের সেবা করিত। যেমন প্রত্যেক আর্য্যবর্ণের এক একটি বিশেষত্ব ছিল, তেমনি নির্ব্বিশেষত্বও ছিল। সকল আর্য্যেরই বর্ণনির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন ও যজন করিবার অধিকার ছিল। সত্যযুগে মনু, ত্রেতায় গোতম, দ্বাপরে শঙ্খ, কলিতে পরাশর—সকল যুগে সকল সংহিতাকার এই সমান অধিকার দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। অনার্য্য শূদ্রেরা যে কেন সমানাধিকার পায় নাই, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ বর্ণবিভাগে কর্ম্মের আদর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পিতার স্বভাবত ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার উপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা সন্তানদিগকে দান করিয়া যান। হিন্দুর প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে, কর্ম্মলব্ধ সঞ্চয়ে নহে। তাই হিন্দু পিতা হিন্দু সন্তানকে কর্ম্মের অধিকারী করিয়া যাইতেন। কোন ক্ষত্রিয় বনপ্রয়াণকালে পুত্রদিগকে এই বলিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন—সম্মুখ সমরে প্রাণ দিও, সমাজকে বিন্দু বিন্দু শোণিতদানে শত্রুনিগ্রহ হইতে রক্ষা করিও, কিন্তু দেখিও যেন ঐশ্বর্য্যলিপ্সামোহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পিতৃপুরুষদিগের নামে কলঙ্ক আনিও না। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরাও এইরূপ গৌরবান্বিত আশীর্ব্বচন

দানে কুলমহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। আর সন্তানেরাও আশৈশব পূর্ব্বপুরুষদের ক্রমভঙ্গরহিত বর্ণধর্ম্মরক্ষণকীর্ত্তি শ্রবণ ও মনন করিয়া মর্য্যাদাপূর্ণ হইত। যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে বালকদিগের অল্পবয়স হইতেই সেই শিক্ষা আরম্ভ না করিলে কর্ম্মঠতা জন্মে না। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ বা অন্য কোন বিশেষ বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিতে গেলে, যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সাধন আবশ্যক। বিংশতিবর্ষীয় যুবকের পক্ষে সূত্রধরের ব্যবসায়শিক্ষা বড়ই কষ্টকর। অত বয়সে তাহার হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা চলিয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া আজ কাল আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের সন্তানদের কি শিখাইব, বুঝিতে পারি না। আমরা অন্ধকারে ঢিল মারি। চতুর্দ্দশ বা ষোড়ষবর্ষ বয়স্ক বালকের বিশেষ প্রতিভা না থাকিলে, নৈসর্গিক চিত্তগতি জানা যায় না। আর কুলধর্ম্মের উপরও আস্থা নাই, তাই তাহাকে সুবিধানুযায়ী একটা বিশেষ শিক্ষালাভে (profession) বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করি। আর না হয় তাহারা কেবল সাধারণভাবে বিদ্যার্জ্জন করিয়া উপাধি বিশিষ্ট হইয়া উকিল বা যে কোন চাকরি অবলম্বন করে। যখন বর্ণধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তখন পিতা এবং বালক,

উভয়েই প্রথম হইতে জানিত যে, কোন্ বিশেষ বিদ্যায় নিপুণ হইতে হইবে।

বর্ণধর্ম্মবিভাগসম্বন্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। আমাদের সংস্কারকেরা য়ুরোপীয় বর্ণ-বিভাগহীন সমাজের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণাশ্রমের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। সেই আপত্তিগুলি ও তুলনার যথাযথ বিচার করা আবশ্যক

বর্ণধর্ম্মে কর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর। অতএব ক্ষত্রিয়সন্তান সদাই আপনার কর্ম্মগত হীনতা অনুভব করিয়া কর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। আর সভ্য য়ুরোপে সকল কর্ম্মই আদরণীয়। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের চক্ষে নীচ ও ঘৃণার্হ, ইহা অলীক কথা। ভিখারী ব্রাহ্মণেরাই ত ক্ষত্রিয়ের বীরকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া থাকেন। দান লইতে ক্ষত্রিয় ঘৃণা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আজীবিকা প্রতিগ্রহ। আজ যদি কোন দরিদ্র ধূলিধূসরিত নগ্নপদ ব্রাহ্মণ তাঁহার লক্ষপতি কায়স্থ শিষ্যের নিকট গমন করিল, আর সেই চিনাংশুকবাসা ছাত্র ছিন্নবসন গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি সেই ধনিসন্তান সম্মানে হীন হইয়া যায়? তবে কি ব্রাহ্মণ উচ্চতর নহেন? শিক্ষক যেমন সম্মান সম্বন্ধে উচ্চস্থান

অধিকার করিলে শিষ্যের অবমাননা হয় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের সম্মানে ক্ষত্রিয়ের হীনতা হয় না। কৃপাচার্য্য অপেক্ষা অর্জ্জুনের বীরোচিত সম্মান অধিকতর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃপাচার্য্য গুরু, তজ্জন্য অর্জ্জুন নিশ্চয়ই তাঁহার পাদস্পর্শ করিতেন। পাদস্পর্শ করিতে গিয়া অর্জ্জুন কি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের হীনতা অনুভব করিয়াছিলেন? বর্ণবিয়োজিত কর্ম্মের বরঞ্চ এক পক্ষে অমর্য্যাদা হইতে পারে। সঞ্চয়ের জন্য কর্ম্ম, অতএব সঞ্চয় হইলেই হইল; কর্ম্মটা যেমনি হউক না কেন—উচ্চ বা নীচ, শুভ বা অশুভ। অলঙ্কার লইয়া কাজ, পতি কেবল একটা উপায় মাত্র।

আর এক আপত্তি, বর্ণবিভাগে অত্যন্ত ভেদভাব হয়। বর্ণমর্য্যাদার আধিক্যবশত এক বর্ণের অপর বর্ণের সহিত আহারপান, আদান প্রদান বা পরিণয়ঘটিত সম্বন্ধ স্বভাবত রহিত হইয়া যায়। য়ুরোপে দেখ এরূপ ভেদভাব নাই। ঐশ্বর্য্য লাভের প্রতিযোগিতায় ভেদভাব চূড়ান্ত হয়। যদি কোন সামান্য বণিক্ আজ কোটিপতি হয়, তাহার বাটীতে স্বয়ং সম্রাট ও লর্ডেরা ভোজন করিতে আসিবেন, কিন্তু সেই হঠাৎ-নবাব বণিকের ভ্রাতার গৃহে কেন—পিতারও গৃহে তাঁহারা কোন দিন পদার্পণ করিবেন না। আর ঐ বণিকের কন্যার বিবাহের

সময় যখন ভোজ হইবে, তখন সাধ্য কি যে, সেই ভোজগৃহে তাহার দরিদ্র ভ্রাতা-ভগিনী এমন কি জনক জননী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া আমন্ত্রিত বড়মানুষদের সঙ্গে একটু চা পান করেন। আর আজ এখানে যদি কোন হাইকোর্টের জজের বাটীতে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার দীনহীন কপর্দ্দকবিহীন জ্ঞাতিকুটুম্ব, যে যেখানে আছে, সকলকেই তাঁহাকে গলবস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। তাঁহারা সকলে আসিয়া এক পংক্তিতে ভোজন না করিলে, বিবাহ কার্য্য পূর্ণ হইবে না। ভেদ-ভাব সকল সমাজেই আছে। তবে আমাদের নাকি অত্যন্ত দুর্দ্দশা, তাই য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে বর্ণধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া অভেদভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেন। আর আহারপানের নিষেধবিধি কি এতই অনুদার? যদি অন্য বর্ণের সহিত আহার সংসর্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে, ঘনিষ্ঠতা আবার যদি গুণবিশিষ্টতাকে মিশ্রণদূষিত করে, তাহা হইলে যথেচ্ছ আহারপানের নিষেধ কি হিতকর নয়? কিন্তু একবর্ণের দ্বিজেরা অন্য বর্ণের দ্বিজদিগের অন্ন ভোজনে কখনই নিবারিত হন নাই। দ্বিজ বলিতে সকল বর্ণের আর্য্যদিগকে বুঝায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বশিষ্টসংহিতা—২য় অধ্যায়)। দ্বিজ মাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দানে অধিকার ছিল (গৌতম

সংহিতা—১০)। তাঁহাদের মধ্যে একটা মৌলিক সমতা ছিল, তজ্জন্য সহভোজনের নিষেধব্যবধানে তাঁহারা ব্যবচ্ছিন্ন হন নাই। যজ্ঞবিরোধী শূদ্রদিগেরই সহিত কেবল ব্যবধান ছিল। কিন্তু যখন বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইল, তখনই বিদ্রোহকে দমন করিবার নিমিত্ত আহারপানবিধির কিছু কড়াকড়ি হইল। তবুও ভিন্ন বর্ণের সহিত ভোজন বন্ধ হয় নাই। কেবল মর্য্যাদা রক্ষণার্থে দুই এক প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করার নিষেধ হইয়াছে।

বর্ণভেদ যে একবারে অনুল্লঙ্ঘনীয় ছিল, তাহা নহে। একবর্ণের সহিত অপরবর্ণের আদান প্রদান চলিত। কর্ম্মাভিমান রক্ষার জন্য সবর্ণবিবাহ প্রশংসনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু লোকরক্ষার্থে অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত; বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ; এবং শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়ের অনুলোমজাত পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র, আর বৈশ্যের অনুলোমজাতপুত্র করণ বলিয়া কথিত হয়। প্রতিলোমক্রমে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র সূত, বৈদেহক ও চাণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার মাগধ ও ক্ষত্তা, আর বৈশ্যার আয়োগব নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। (যাজ্ঞবল্ক্য—৯৬) প্রতিলোম-বিবাহ আদরণীয় ছিল না; বিশেষত শূদ্রের প্রতিলোম-দাম্পত্য অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। হীনজাতির কন্যা গ্রহণ করায় তত ক্ষতি হয় না, যত কন্যাদানে হয়। কোল-ভীলেরা যদি আমাদের কন্যাগুলিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হই না? দ্বিজবর্ণের মধ্যে অনুলোম বা প্রতিলোমজাত পুত্র দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত হয়। মেধাতিথির মতে প্রতিলোমজাত পুত্রেরও উপনয়ন কর্ত্তব্য (মনুসংহিতা—১০, ২৮)। এই সকল অসবর্ণসম্মেলন-সম্ভূত জাতিসকল বর্ণোৎকর্ষও লাভ করিত (যাজ্ঞবল্ক্য—১)। মনু বলেন যে, শূদ্র ও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টজাতিভাবাপন্ন হয় (১০ম অধ্যায়—৩৩৫)। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ণোৎকর্ষলাভ এক পুরুষে হইত না, কারণ বর্ণধর্ম্ম ব্যক্তিগত কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু কৌলিক কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন অম্বষ্ঠবংশ তিন চারি পুরুষ শুদ্ধ ব্রাহ্মণাচারী হয়, তাহা হইলে সেই বংশ বিপ্রত্ব লাভ করে—এইরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেবল এক পুরুষ ব্রাহ্মণধর্ম্মী হয়, আর সেই ধর্ম্ম পুরুষ-পরম্পরাগত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না।

বর্ণবিভাগ যে কেবলমাত্র ভেদভাবের পোষণ করে,

ইহা সত্য নহে। ইহা অবস্থানুসারে উদার হয়। কালে ইহা উদার এত হইয়া উঠিল যে, শূদ্রসম্মেলনজাত সঙ্কর-বর্ণের গুরুভারে আর্য্যেরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সঙ্করজাতিরা আর্য্যজাতির উচ্চ লক্ষ্য বুঝিতে পারে নাই। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ভিতর বৈষম্য আনিয়াছিল, নিবৃত্তমার্গকে প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করিয়াছিল। বৈষম্যদোষে আর্য্যসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসাদ বৈনাশিক বৌদ্ধবাদের প্রসরভূমি হইয়াছিল। ভারত আর্য্য-আদর্শবিরহিত হইয়া অধঃ-পতিত হইল। যে আর্য্যেরা অত্যুদারতার জন্য বিখ্যাত, তাহারাই আজ অনুদার বলিয়া নিন্দিত। আর নিন্দা করে কারা?—যারা পরাজিত জাতি সকলের সহিত কখনও মিলিতে পারে না। মার্কিনের হস্তে আদিম-জাতির আজ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। কেবল পুঁথিগত উদারতার আড়ম্বর দেখিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে অনুদার ও নিষ্ঠুর বলিয়া গুরুনিন্দাপাতকে পাতকী হইয়াছি।

য়ুরোপে বর্ণভেদ নাই বলিয়া তথায় সামাজিক ভেদভাব নাই, এই ধারণা মনগড়া। সেখানে ঐশ্বর্য্য-শালীতে আর দীন শ্রমজীবীতে এত প্রভেদ যে, তাহাদের জিগীষার আদর্শ জিঘাংসায় পরিণত হইয়াছে।

বৈনাশিকেরা (Nihilist) ও সামাজিক সাম্যবাদীরা (socialist) তাহার সাক্ষী। শ্রমজীবীদিগের বিপুল ধর্ম্মঘটসকল য়ুরোপকে ব্যস্ত করিয়াছে, বিরোধের ভয়ঙ্কর ছবি দেখাইয়া য়ুরোপীয় সমাজকে ভীত করিয়াছে।

বর্ণধর্ম্মে জিগীষাপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টি হয় না, মানব-বুদ্ধি কর্ম্মবদ্ধ হইয়া পড়ে ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর পথে অগ্রসর হইতে পারে না। য়ুরোপে ওরূপ বন্ধন নাই, তাই তথায় জিগীষা আছে, বিজয়লক্ষ্মীর শোভা আছে, প্রতিভার স্ফূর্ত্তির জন্য প্রশস্ত ভূমি আছে, উন্নতির অনন্ত পথ খোলা আছে। আর এখানে কোন ব্যক্তি যদি কৌলিক কর্ম্ম করিতে অপটু হয়, যদি তাহার প্রতিভা পরধর্ম্মপালনে স্বভাবত ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন উপায় নাই। তাহাকে বর্ণের বেড়ার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া তাহার নৈসর্গিক বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিতে হয়। বর্ণধর্ম্ম এ প্রকার অপ্রশস্ত নয়। বর্ণ-ধর্ম্মপালনে প্রতিভার যথেষ্ট উৎকর্ষ হইত। তাহাতে প্রতিভার স্বাধীনতা নষ্ট হইত না। জনক ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সকলে আপন-আপন বর্ণধর্ম্ম পালন করিবে, এইরূপ শাসন ছিল বটে, কিন্তু প্রতিভা-

শালী ব্যক্তিরা এই শাসন যে অতিক্রম করিতে পারিত না, এমত নহে। আর আপৎকালে বা লোকরক্ষার্থে জনসাধারণে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। গৌতম বলিয়াছেন—আপৎকালে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা-সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে (গৌতম সংহিতা—৭)। ব্রাহ্মণ স্বকীয় ধর্ম্মপালনে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিতে পারিলে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে ও কালের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কৌলিক কর্ম্মে নিরত থাকাই বিধি ছিল। কিন্তু বিধি লোকস্থিতির জন্য। তজ্জন্য বিধিসকলকে কালানুসারে প্রসারিত বা সংকুচিত করিতে হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলমর্য্যাদা রক্ষা হয়, অথচ স্থিতিভঙ্গ না হয়—এই সংহিতাকার-দিগের উদ্দেশ্য ছিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসে সকল সময়ে স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য যথাযথ হইয়াছিল কিনা, তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে বর্ণধর্ম্ম স্থিতিশীল হইলেও কালের গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বংশগৌরবের দ্বারা

চালিত না হইলে সমাজ কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। বিলাতে বর্ণধর্ম্ম নাই। তথায় মোটামুটি ঐশ্বর্য্যলাভানুসারে কর্ম্মের আদর। তাই আজ সেখানে যুদ্ধে যাইবার জন্য লোক পাওয়া যাইতেছে না। লর্ড কিচনর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আনাড়ি লোক পাঠাইলে আর চলিবে না। শস্ত্রব্যবসায়ে তত পয়সা আসে না, তত প্রতিষ্ঠা নাই ; তজ্জন্য লোকের ইহাতে তত আস্থা নাই। রাজপুরুষেরা তথায় বলপূর্ব্বক লোকদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কর্ম্মকুলগত হইলেই যে হীন হয়, আর স্বাধীন হইলেই যে শোভন হয়, এমন নহে।

এক হইতেই বহু হইয়াছে বা একই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যাহাতে একেতেই আবার সব পর্য্যবসিত হয়, তাহাই আমাদের সাধন। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে কর্ম্মসূত্র বিনষ্ট হয়। কিন্তু সংসারে রজোগুণেরই প্রাবল্য। মর্য্যাদা রজোগুণের উত্তমাংশ। এই উত্তমাংশকে চালিত করিলে প্রকৃতি সত্ত্বানুকূল হয়। পরমার্থতত্ত্ব রজোবিশিষ্ট প্রকৃতিতে ভাল স্থান পায় না। তজ্জন্য সেই প্রকৃতিকে রজোগুণেরই সুবিহিত চালনার দ্বারা সুপথে লইয়া যাইতে হয়। অতএব ঋষিরা আশ্রমধর্ম্মনিয়মিত কুলমর্য্যাদার ভিত্তিতে কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফললিপ্সা-

দোষ হইতে উহাকে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ রজ ও সত্ত্বের বিরোধ ভঙ্গ করে, রজোগুণকে সত্ত্বানুযায়ী করে, প্রকৃতিকে সাম্যাবস্থায় আনয়নের উদ্যোগ করে। এই একনিষ্ঠতার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখা ও সমাজকে রাজসিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া সাত্বিক পথে লইয়া যাওয়া অতি দুষ্কর। নেতারা জ্ঞানী ও ত্যাগী না হইলে আদর্শ নষ্ট হইবার আশু সম্ভাবনা। এই দুরূহ নেতৃত্ব-ভার লইবার জন্য ব্রাহ্মণবর্ণের উদ্ভাবনা। তাঁহাদের বিশেষ কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন। তাঁহাদের আজীবিকা প্রধানত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অযাচিত দানের উপর নির্ভর করিত। ঐশ্বর্য্যসঞ্চয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল কঠোর শমদমসংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়মিত ছিল। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা অবমানিত, লাঞ্ছিত, পরিবর্জ্জিত হইতেন। মনু বলেন—যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ বলেন—বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না (বশিষ্ঠসংহিতা —৩)। সমাজকে একত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইঁহাদেরই উপর ভার ছিল। ইঁহারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, শস্ত্রজীবী ছিলেন না। তাই তাঁহাদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। য়ুরোপে রাজনীতি তন্তুবায়

ও মদ্যবিক্রয়ীদিগের হস্তে পড়িয়া আজ কত না কলুষিত হইয়াছে? সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি রাজনীতি শুদ্ধত্ব রাখিবার জন্যই নেতাদিগকে স্বার্থশূন্য শুদ্ধতায় ভূষিত করা হইয়াছিল।

একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্য্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে। হিন্দুত্বের এক অটল ভিত্তি আছে, এইরূপ বোধ ও আত্মমর্য্যাদা উদ্ভাবিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সংস্কার করিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িবে।

সমাপ্ত